Islami Ain O Bichar
Vol. 16, Issue: 64
October-December 2020

কিশোর অপরাধের কারণ ও প্রতিকার : ইসলামী দৃষ্টিকোণ

Causes and Remedies of Juvenile Delinquency Perspective Islamic Law

Muhammad Sayedul Haque*

ABSTRACT

Juvenile delinquency is one of the major problems that have posed growingly dangerous figure in different countries of the world including Bangladesh. At present, a sizable number of teenagers are involved in various crimes including theft, robbery, snatching, rape, murder, drug abuse and eve-teasing. Such immoral and character-destroying practices of teenagers have left the sociologists, psychologists, lawyers, politicians and the elite society deeply concerned. They are considering it as an omen of great danger for the nation. This article has aimed at protecting the teenagers against this catastrophic scourge. Given that the paper has sought to determine the juvenile age and define juvenile delinquency and crime, and thereby tried to identify the causes of juvenile delinquency. After discussing the guidelines given by Islam for the prevention of juvenile delinquency, a set of recommendations has been put forward for the prevention of juvenile delinquency.

Keywords: Juvenile; Age; Crime; Eve-teasing; Islam; Minute Sin; Grave Offence.

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যেসব সমস্যা ক্রমশ ভয়াবহরূপ ধারণ করছে তন্মধ্যে কিশোর অপরাধ অন্যতম। বর্তমান সময়ে কিশোরদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, ধর্ষণ, হত্যা, মাদকসেবন, ইভটিজিংসহ বিভিন্ন অপরাধে জড়িয়ে পড়েছে। কিশোরদের এহেন অনৈতিক ও চরিত্র-বিধ্বংসী কাজ সমাজবিজ্ঞানী, মনোবিজ্ঞানী, আইনবিদ, রাজনীতিবিদ ও সুশীলসমাজকে গভীরভাবে ভাবিয়ে তুলেছে এবং তারা একে জাতির জন্য অশনিসংকেত মনে করছেন। এ সর্বনাশা ছোবল থেকে কিশোরসমাজকে বাঁচানোর লক্ষে এ প্রবন্ধের অবতারণা। এ প্রবন্ধে কিশোর বয়স, কিশোর অপরাধ, অপরাধ এর সংজ্ঞা প্রদান করত কিশোর অপরাধের কারণ চিহ্নিত করা হয়েছে। অতঃপর কিশোর অপরাধ প্রতিরোধে ইসলাম যে নির্দেশনা দিয়েছে তা আলোচনা করে কিশোর অপরাধ প্রতিরোধের লক্ষে একটি সুপারিশমালা পেশ করা হয়েছে।

মূলশব্দ : কিশোর, বয়স, অপরাধ, ইভটিজিং, ইসলাম, সাগীরা, কাবীরা।

* Dr. Muhammad Sayedul Haque is a professor in the School of Social Science, Humanities & Languages (SSHL), Bangladesh Open University. email: saydulbou1998@gmail.com

ভূমিকা

মহান আল্লাহ মানবজাতির সৃষ্টিকর্তা। তিনি আদম (আ) ও হাওয়া (আ) এর মাধ্যমে পৃথিবীতে অসংখ্য নারী ও পুরুষ ছড়িয়ে দিয়েছেন। তিনি তাঁদের মাধ্যমে মানুষকে সন্তান নামক নিয়ামত দান করেছেন। এরা আমাদের আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। তারা ধীরে ধীরে বেড়ে ওঠে। তাদের এ বেড়ে ওঠা আমাদের জন্য যেমন আনন্দদায়ক ও নয়নপ্রীতিকর তদ্রূপ কখনো কখনো উৎকণ্ঠার বিষয়ও। বিভিন্ন পারিপার্শ্বিকতার কারণে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তারা অপরাধজগতে ঢুকে পড়ে। বিশেষত তারা যখন কিশোর বয়সে উপনীত হয় এবং অপরাধমূলক কাজে জড়িয়ে পড়ে তখন সমাজচিন্তক শ্রেণিকে ভাবিয়ে তোলে। সুতরাং তাদের অপরাধ জগতে প্রবেশের কারণ চিহ্নিত করে প্রতিকারের বিষয় খুঁজে বের করতে হবে। অত্র প্রবন্ধে এ বিষয়টিই তথ্য-উপাত্ত দিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

উদ্দেশ্য : চরম নৈতিক অবক্ষয়ের বর্তমান এ সময়ে কিশোর সমাজ ব্যাপকহারে বিচিত্র ধরনের অপরাধে জড়িয়ে পড়েছে। ফলে তারা যেমন নিজেদের ভবিষ্যতকে অন্ধকারে ঠেলে দিচ্ছে তদ্রূপ জাতির সর্বনাশ ডেকে আনছে। এমতাবস্থায় তাদেরকে কীভাবে এ ধ্বংসাত্মক অবস্থা থেকে তুলে এনে সুনাগরিক রূপে এবং জাতির ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব গ্রহণের উপযোগী করে তোলা যায়– সেবিষয়ে নির্দেশনা প্রদানের উদ্দেশেই এ প্রবন্ধ রচনা।

যৌক্তিকতা : কিশোর সমাজ আমাদের প্রাণশক্তি ও ভবিষ্যৎ নেতৃত্বের চালিকাশক্তি। মূল্যবোধের অবক্ষয়ের কারণে তারা কিংকর্তব্যবিমূঢ়। সর্বগ্রাসী ধ্বংসের অতল গহীনে তলিয়ে যাওয়ার পূর্বেই যে কোনো মূল্যে তাদেরকে রক্ষা করতে হবে। সুতরাং এ বিষয়ে গবেষণা প্রবন্ধ রচনা করে দিকনির্দেশনা প্রদান করা একান্তভাবে যৌক্তিক।

গবেষণাপদ্ধতি : প্রবন্ধটি সমাজবিজ্ঞানী, মনোবিজ্ঞানী, চিকিৎসাবিদ, সমাজচিন্তকদের যুক্তিপূর্ণ অভিমত এবং কুরআন-হাদীসের বর্ণনার আলোকে বিন্যস্ত করা হয়েছে।

কিশোর বয়স

অপরাধের সঙ্গে বয়সের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। বয়সের তারতম্য অনুসারে সাধারণ অপরাধী ও কিশোর অপরাধীর মাঝে পার্থক্য নিরূপণ করা হয়। শৈশবের শেষ ও যৌবন শুরু হওয়ার মধ্যবর্তী সময়কে কৈশোর বা বয়ঃসন্ধিকাল বলা হয়। উল্লেখ্য যে,

কিশোর বয়সের পৃথক কোনো সীমা বেঁধে দেওয়া হয়নি, তবে শিশু-কিশোরের বয়স একই সময়সীমার মধ্যে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। তাই আমরা দেখি, ইংরেজি Teens বলতে ১৩ থেকে ১৯ বছর পর্যন্ত বয়সসীমা বোঝায় (The years of one's age from thirteen to ninteen) (Payar 2010, 704)। আর এ বয়সকে শিশু-কিশোর বয়স হিসেবে ধরা হয়।

তবে সুনির্দিষ্টভাবে কত বছর বয়সসীমা পর্যন্ত অপরাধ কিশোর অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হবে তা নির্ভর করে সেই দেশের অপরাধ আইনের ওপর। যেমন জাতিসংঘ সনদের ধারা : ১-এ ১৮ বছরের কম বয়সী প্রত্যেককে শিশু হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে (Islam 1997, 9)। তাই ১৮ বছরের নিচে প্রতিটি মানবসন্তানই শিশু, যদি না শিশুর জন্য প্রযোজ্য আইনের আওতায় ১৮ বছরের আগে শিশুকে সাবালক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। (UNICEF 1992, 8)

ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে শিশু-কিশোরের বয়স নির্ণয়

আরবি আত-তিফল (الطفل) এর আভিধানিক অর্থ শিশু। আর শিশু বলতে প্রত্যেক বস্তুর ক্ষুদ্র অংশকে বোঝায়। (Ibn Manẓūr 1988, 401)

ইবনে মানযুর বলেন,

الصَّبِيُّ يُدْعى طِفْلًا حِينَ يَسْقُطُ مِنْ بَطْنِ أُمه إِلى أَن يَحتلم.

মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ট হওয়ার পর স্বপ্নদোষ হওয়া পর্যন্ত বয়সকালীন মানবসন্তানকে শিশু বলা হয়। (Ibn Manẓūr 1988, 402)

ইসলামী শরীআহ মোতাবেক প্রত্যেক শিশু পনেরো বছর বয়সে উপনীত হলে প্রাপ্তবয়স্ক (বালেগ) হয় এবং তার ওপর ইসলামী বিধি-বিধান আরোপিত হয়। বয়স ছাড়াও প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার আরও কিছু আলামত রয়েছে। যেমন: স্বপ্নদোষ হওয়া, নাভির নিচে পশম গজানো এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে ঋতুস্রাব হওয়া। এই বিষয়ে নিম্নে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেন,

﴿وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾

আর তোমাদের সন্তানসন্ততি বয়ঃপ্রাপ্ত হলে তারাও যেন অনুমতি প্রার্থনা করে যেমন অনুমতি প্রার্থনা করে বয়োজ্যেষ্ঠরা। এইভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর নির্দেশ স্পষ্টভাবে বিবৃত করেন, আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (Al-Qurān, 24:59)

নাফি' থেকে বর্ণিত, আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. বলেন,

عَرَضَنِى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَوْمَ أُحُدٍ فِى الْقِتَالِ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُجِزْنِى وَعَرَضَنِى يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَنِى. قَالَ نَافِعٌ فَقَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ خَلِيفَةٌ فَحَدَّثْتُهُ هَذَا الْحَدِيثَ

فَقَالَ إِنَّ هَذَا لَحَدٌّ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ. فَكَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ أَنْ يَفْرِضُوا لِمَنْ كَانَ ابْنَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَاجْعَلُوهُ فِى الْعِيَالِ.

রাসূলুল্লাহ সা. উহুদের যুদ্ধের দিন যোদ্ধাদের সারিতে আমাকে পর্যবেক্ষণ করলেন। তখন আমার বয়স চৌদ্দ বছর। তাই তিনি আমাকে যুদ্ধে অংশগ্রহণের অনুমতি দিলেন না। খন্দকের যুদ্ধের দিনও তিনি আমাকে পর্যবেক্ষণ করলেন। তখন আমার বয়স পনের বছর। ফলে তিনি আমাকে যুদ্ধে অংশগ্রহণের অনুমতি দিলেন। নাফি' বলেন, উমর ইবনে আবদুল আযিয রহ. যখন খলিফা তখন আমি তাঁর কাছে গেলাম এবং তাঁকে এই হাদিস বর্ণনা করলাম। তিনি বললেন, এটাই (পনের বছর বয়সই) ছোট ও বড়'র (অপ্রাপ্তবয়স্ক ও প্রাপ্তবয়স্ক) মধ্যে সীমারেখা। তিনি তাঁর প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের কাছে এই মর্মে ফরমান পাঠালেন, তাঁরা যেন পনের বছর বয়সের লোকদের (পূর্ণ) ভাতা প্রদান করেন এবং তার চেয়ে কম বয়সের যারা তাদেরকে পরিবারের অপ্রাপ্তবয়স্ক সদস্যরূপে গণ্য করেন। (Muslim 2003, 4944)

এই হাদিস থেকে বোঝা যায় যে, শিশুরা পনের বছরেই সাবালক বা প্রাপ্তবয়স্ক হয়। শিশুদের বয়স পনের হলে তাদের ওপর ধর্মীয় বিধি-বিধান পালন আবশ্যক হয়।

আবু বকর আল-জাযায়িরি রহ. আইসারুত তাফাসীর-এ 'আল-হুলমু' শব্দের ব্যাখ্যায় বলেন,

أي سن التكليف وهو وقت الاحتلام خمسة عشر سنة فما فوق.

অর্থাৎ, দায়িত্ব আরোপের বয়স, তা হলো স্বপ্নদোষের সময় : পনের বছর বা তার চেয়ে বেশি। (Al-Jazā'irī 2003, 3/588)

স্বপ্নদোষ হওয়ার অর্থ হলো ছেলে বা মেয়ের ঘুমন্ত অবস্থায় বীর্যপাত হওয়া। জাগ্রত অবস্থায় বীর্যপাত ঘটতে পারে। বীর্যপাতের সময় থেকে তারা সাবালক হিসেবে গণ্য হবে। অধিকাংশ আলিমের মত এটাই।

হাম্বলি মাযহাবের ইমাম ইবনে কুদামা রহ. বলেন,

وَأَمَّا السِّنُّ، فَإِنَّ الْبُلُوغَ بِهِ فِي الْغُلَامِ وَالْجَارِيَةِ بِخَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً. وَبِهَذَا قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ وَقَالَ دَاوُد: لَا حَدَّ لِلْبُلُوغِ مِنْ السِّنِّ، لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ، عَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ» . وَإِثْبَاتُ الْبُلُوغِ بِغَيْرِهِ يُخَالِفُ الْخَبَرَ. وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ وَقَالَ أَصْحَابُهُ: سَبْعَ عَشْرَةَ، أَوْ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ. وَرُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فِي الْغُلَامِ رِوَايَتَانِ. إحْدَاهُمَا، سَبْعَ عَشْرَةَ، وَالثَّانِيَةُ، ثَمَانِيَ عَشْرَةَ. وَالْجَارِيَةُ سَبْعَ عَشْرَةَ بِكُلِّ حَالٍ.

ছেলে ও মেয়ের ক্ষেত্রে সাবালকত্ব নির্ণীত হবে বয়সের দ্বারা। তা হলো পনেরো বছর। এটা আওযায়ী, শাফিয়ী, আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদের মত। দাউদ বলেন, বয়সের দ্বারা সাবালকত্ব নির্ণীত হবে না। কারণ রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, 'তিন ব্যক্তি থেকে কলম উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে (তাদের ওপর শরীআহর বিধান আবশ্যক নয়); শিশু থেকে যতক্ষণ না তার স্বপ্নদোষ হয়।' সুতরাং স্বপ্নদোষ ছাড়া অন্যকিছুর

দ্বারা সাবালকত্ব নির্ণয় করা হাদিসের বিরোধিতার পর্যায়ে পড়ে। এটা ইমাম মালিকের অভিমত। মালিকী মাযহাবপন্থীরা বলেছেন, সতের বছর বয়সে বা আঠার বছর বয়সে বালেগ হবে। ইমাম আবু হানিফা থেকে বালকদের ক্ষেত্রে দুটি মত বর্ণিত হয়েছে। সতের বছর বা আঠার বছর বয়সে তারা বালেগ হবে। আর মেয়ে বালেগ হবে সতের বছর বয়সে। (Ibn Qudāmah 1968, 4/346)

ইমাম শাফিয়ী রহ. বলেন,

لَيْسَ عَلَى الصَّبِيِّ حَجٌّ حَتَّى يَبْلُغَ الْغُلَامُ الْحُلُمَ وَالْجَارِيَةُ الْمَحِيضَ فِي أَيِّ سِنٍّ مَا بَلَغَاهَا أَوْ اسْتَكْمَلَا خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَإِذَا بَلَغَا اسْتِكْمَالَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، أَوْ بَلَغَا الْمَحِيضَ أَوْ الْحُلُمَ، وَجَبَ عَلَيْهِمَا الْحَجُّ

শিশুর ওপর হজ্জ ফরজ নয়, যতক্ষণ না ছেলের স্বপ্নদোষ হয় এবং মেয়ের ঋতুস্রাব হয়, সেটা যে-বয়সেই হোক, অথবা যতক্ষণ না তাদের উভয়ের বয়স পনের বছর পূর্ণ হয়। সুতরাং ছেলেশিশু ও মেয়েশিশুর বয়স পনের বছর পূর্ণ হলে অথবা মেয়েশিশুর ঋতুস্রাব এবং ছেলেশিশুর স্বপ্নদোষ হলে তাদের ওপর হজ্জ ওয়াজিব হবে। (Al-Shāfiʿī 1990, 2/121)

কিশোর অপরাধ

মানবজীবনে কৈশোরকাল নানা প্রতিকূলতা ও প্রতিবন্ধকতার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়। এসময়টি আইন ও বাধা-বিঘ্ন না মানার বয়স। এ সময় কিশোররা অস্থির মনে অনেক কিছু ভাবে। সংক্ষেপে বলা যায়, যেসব কাজ প্রাপ্তবয়স্কদের দ্বারা সংঘটিত হলে অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হয় সে ধরনের প্রচলিত আইন ভঙ্গকারী কাজ কিশোরদের দ্বারা সংঘটিত হলে সেটিকে কিশোর অপরাধ বলা হয়। (Sadek 1989, 31)

অপরাধবিজ্ঞানী ক্যাভান ও ফারদিন্যান্ড এর মতে, "সমাজ কর্তৃক কাঙ্ক্ষিত আচরণ প্রদর্শনে কিশোরদের ব্যর্থতাই কিশোর অপরাধ।" (Ghoshal 1999, 122)

পি ডাব্লু তাপ্পন কিশোর অপরাধীর চারটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন :

(ক) যার বৃত্তি, আচরণ, পরিবেশ অথবা সংগীতদল তার নিজস্ব কল্যাণকর পথে ক্ষতিকর ;

(খ) যে অবাধ্য কিংবা যে তার পিতামাতা বা অভিভাবকদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় ;

(গ) ইচ্ছাকৃতভাবে যে স্কুল পালায় কিংবা সেখানকার নিয়ম-শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে এবং

(ঘ) যে রাষ্ট্রিক আইন পৌরবিধি বহির্ভূত কাজ করে। (Tappan 1949, 17)

অপরাধ-এর সংজ্ঞা

সাধারণভাবে বলা যায়, অপরাধ বলতে এমন সব সমাজবিরোধী বেআইনী কাজ বোঝায় যা ক্ষতিকর হওয়ার কারণে পরিত্যাজ্য। এধরনের কাজ যাদের দ্বারা সংঘটিত হয় সমাজবিজ্ঞানীগণ তাদের অপরাধী হিসেবে অভিহিত করেছেন। প্রচলিত আইনের পরিভাষায় : Offence for which one may be punnisment by law. (Cowie 1989, 282)

The wrong causing such violation is called Crime or Zarima or Masiah (Qadri 1986, 286-287).

আভিধানিক অর্থ

আরবি প্রতিশব্দ আল-জারীমা (الجريمة)। এর বহুবচন আল-জারাইম (الجرائم)। এর শাব্দিক অর্থ অপরাধ, আইনবিরোধী কাজ ইত্যাদি। (Mustafā, 1972, 139) এর ইংরেজি প্রতিশব্দ Crime, Offence (Cowie 1989, 282).

পারিভাষিক অর্থ

الجرائم فى الشريعة الاسلامية بأنها محظورات شرعية زجره الله عنها بحد أو تعزير-

আল-জারীমা (الجريمة) : অপরাধ বলতে শরী'আতের এমন আদেশ ও নিষেধ বোঝায় যা লঙঘন করলে হদ্দ (নির্ধারিত শাস্তি) অথবা তাযীর (দণ্ডবিধি) প্রযোজ্য হয় এবং যার কারণে মহান আল্লাহ হুমকি প্রদান করেছেন (Al-Māwardī 1973, 219)।

শরী'আতের আদেশ ও নিষেধ লঙ্ঘন বলতে বোঝায়- এমন কাজে লিপ্ত হওয়া যা করতে শরী'আতে নিষেধ করা হয়েছে এবং এমন কাজ ত্যাগ করা যা করতে শরী'আতে আদেশ দেওয়া হয়েছে। অতএব এমন প্রতিটি কাজে লিপ্ত হওয়াই অপরাধ-শরী'আতে যা নিষেধ করা হয়েছে এবং নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করে তাতে লিপ্ত হলে শাস্তির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। অনুরূপভাবে এমন প্রতিটি কাজ না করা অপরাধ-শরী'আত যা করতে নির্দেশ দিয়েছে এবং না করলে শাস্তিযোগ্য ঘোষণা করেছে । ('Awdah 2003, 66)

অপরাধ এর শ্রেণিবিভাগ

ইসলামী বিধানে অপরাধকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে -

(১) ছোট (সাগীরা), (২) বড় (কাবীরা)

যেমন মহান আল্লাহর বাণী,

﴿إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُّدْخَلاً كَرِيماً﴾

তোমাদের যা নিষেধ করা হয়েছে তার মধ্যে যা গুরুতর তা থেকে বিরত থাকলে তোমাদের লঘুতর পাপগুলো মোচন করবো এবং তোমাদেরকে সম্মানজনক স্থানে দাখিল করবো। (Al-Qurān, 4:31)

এ আয়াতে কাবায়ির ও সায়্যিয়াত দুই প্রকার গুনাহের কথা বলা হয়েছে। আর তাহলো কবীরা (Major crime) ও সগীরা (Minor crime)। কবীরা গুনাহ তাওবা দ্বারা মোচন হয়। যেমন মহান আল্লাহর বাণী,

﴿إِلاَّ ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِن بَعْدِ ذٰلِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾

তবে যদি এরপর তারা তাওবা করে ও নিজেদের সংশোধন করে, তাহলে তো আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু । (Al-Qurān, 24:05)

কবীরা ঐ গুনাহকে বলা হয়, যা থেকে নিষেধ করা হয়েছে এবং যা নিষিদ্ধ হওয়ার বিষয়ে কুরআন ও হাদীসে সুস্পষ্ট ঘোষণা রয়েছে। এ ছাড়াও এর পরিণামে আযাব ও অভিশাপ নাযিলের কথা বলা হয়েছে। (Al-Taftāzānī 1982, 104)

কোনো কোনো কবীরা গুনাহ তাওবা দ্বারা ক্ষমা করা হয়। আবার কিছু সংখ্যক কবীরা গুনাহ এমন আছে যেগুলো রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পৃক্ত, সেগুলোর জন্য নির্দিষ্ট দণ্ড ভোগ করতে হয়। আবার কিছুসংখ্যক এমন আছে, যা কিসাস ও কাফ্ফারা উভয় দিয়ে প্রতিবিধান করা যায়। (Tabbārah 1983, 12-13)

আর সগীরা এর অপরাধ হুদুদ বা বিধিবদ্ধ দণ্ড দ্বারা কার্যকর করা বিধি সম্মত নয়। তবে সগীরা গুনাহ বারবার করতে থাকলে কবীরা গুনাহে পরিণত হয় এবং তা নেক কাজ দ্বারা কাফ্ফারা হয়ে যায়। ('Ulwān 1981, 1/171) কেননা মহান আল্লাহ বলেন,

﴿إِنَّ ٱلْحَسَنَٰتِ يُذْهِبْنَ ٱلسَّيِّـَٔاتِ﴾

সৎকাজ অবশ্যই অসৎকাজ মিটিয়ে দেয়"... । (Al-Qurān, 11:114)

কোনো কোনো ইসলামী আইনবিদের মতে শাস্তির মাত্রার দিক থেকে অপরাধ তিন প্রকার। যথা-

(ক) **হদ্দ এর আওতাভুক্ত অপরাধ :** যে অপরাধের জন্য হদ্দ নির্ধারণ করা হয়েছে। যেমন-ব্যভিচার, ব্যভিচারের অপবাদ, মদপান, চুরি, ডাকাতি, বিদ্রোহ ও ধর্মত্যাগ ইত্যাদি।

(খ) **কিসাস ও দিয়াতের আওতাভুক্ত অপরাধ:** যেসব অপরাধের জন্য কিসাস (মৃত্যুদণ্ড বা অঙ্গহানি) অথবা দিয়াত (রক্তপণ) নির্ধারণ করা হয়েছে। যেমন, স্বেচ্ছা-হত্যা, ভুলজনিত হত্যা এবং ইচ্ছাকৃত কিংবা অনিচ্ছাকৃতভাবে মানবদেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ক্ষতি সাধনের অপরাধসমূহ এ শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত।

(গ) **তা'যীরের আওতাভুক্ত অপরাধ:** উপরে বর্ণিত অপরাধসমূহ ব্যতীত অন্য সকল অপরাধ এ শ্রেণিভুক্ত। এ শ্রেণির অপরাধের শাস্তি শরী'আতে নির্ধারণ করা হয়নি। বরং শাস্তি নির্ধারণের বিষয়টি সরকার বা তার প্রতিনিধির ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, 'ক' এ বর্ণিত অপরাধসমূহের শাস্তি রহিত করা যায় না, এমনকি বিচারক কিংবা বাদী কেউই তা ক্ষমা করতে পারে না ('Awdah 2003, 80)। 'খ' এ বর্ণিত অপরাধসমূহের শাস্তি ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা তার ওয়ারিসগণ দিয়াত (রক্তপণ) গ্রহণের বিনিময়ে ক্ষমা করতে পারে, এমনকি দিয়াতও ক্ষমা করতে পারে। এ ক্ষেত্রে অপরাধী শাস্তি থেকে রেহাই পাবে ('Awdah 2003, 81)। 'গ' এ বর্ণিত অপরাধের সংখ্যা 'ক' ও 'খ' এ উল্লেখিত অপরাধসমূহের ন্যায় সীমিত নয়। এ ক্ষেত্রে সরকার বা বিচারক অপরাধীকে ক্ষমা করতে পারেন। তবে এই ক্ষমা আইনগতভাবে তখনই কার্যকর হবে যদি তার ক্ষমার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্তপক্ষের অধিকার ক্ষুণ্ন না হয়। এ ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিও অপরাধীকে ক্ষমা করতে পারে। কিন্তু সমাজ ও রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কৃত অপরাধ বিচারক ক্ষমা করতে পারেন না। ('Awdah 2003, 82)

কোনো কোনো অপরাধবিজ্ঞানী অপরাধকে জঘন্য ও সাধারণ-এ দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন। তাই যে অপরাধের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড বা দীর্ঘ মেয়াদী কারাবরণ সেগুলোকে জঘন্য অপরাধ বলা হয়। আর যেসব অপরাধের জন্য জরিমানা প্রদান বা স্বল্পকালীন সময় কারাবরণ করতে হয় সেগুলোকে সাধারণ অপরাধ বলা হয়। তবে তারা দেশ ও আইনভেদে অপরাধের শ্রেণিবিভাগ ভিন্নও হতে পারে বলে অভিমত দিয়েছেন । (Sadek 1989, 47)

কিশোর অপরাধীদের শ্রেণিবিভাগ

সমাজবিজ্ঞানীগণ কিশোর অপরাধীদের বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন। যেমন -

দুর্বোধ্যমনস্ক : ইংরেজিতে একে problem boy বলা হয়। অনেক কিশোর-কিশোরী এমন আছে যে, তারা কী চায় তারা নিজেরাই তা জানে না এবং তাদের লক্ষ-উদ্দেশ্যও স্পষ্ট নয়। তাই কোনো কাজই তাদের ভালো লাগে না। এককথায় তাদেরকে দুর্বোধ্যমনস্ক বলা হয়।

একরোখা : এ শ্রেণির কিশোর-কিশোরী এমন হয় যে, তারা লক্ষ ও পথ পরিবর্তন করতে চায় না এবং তারা সবকিছু তাৎক্ষণিক পেতে চায়। কিন্তু কোনো কারণে তা পেতে অসমর্থ হলে তাদের ভাবাবেগ নষ্ট হয় এবং তাদের মাঝে নৈরাশ্যভাব সৃষ্টি হয়।

অপরাধমুখী : অপরাধমুখী কিশোরদের মাঝে অপরাধপ্রবণতা বেশি থাকে। তারা সুযোগ পেলেই অপরাধে জড়িয়ে পড়ে। তাদের অপরাধ প্রতিরোধ সম্পর্কীয় স্নায়ু অত্যন্ত দুর্বল।

নেতৃত্ববিলাসী : এরা অত্যন্ত নেতৃত্ববিলাসী হয়ে থাকে। এদের কেউ কেউ এজন্য নিজেদের মধ্যে মারপিট করতেও দ্বিধাবোধ করে না। কিন্তু তাদের সবার মাঝে নেতৃত্বের গুণ থাকে না। (Salam 1989, 117)

আরো একদল কিশোর-কিশোরী আছে যারা কখনো কখনো পিতামাতার কারণে অপরাধে জড়িয়ে পড়ে। যেমন- (ক) কিছু সংখ্যক পিতামাতা এমন আছে যারা সন্তানকে দেখাশুনা না করে সংসার থেকে পালিয়ে যায়। ফলে সন্তান তাদের অপত্য স্নেহ থেকে বঞ্চিত হয় এবং তাদের দেখভাল করার উপযুক্ত অভিভাবকের অভাবে তারা অপরাধমূলক কাজে জড়িয়ে পড়ে। (খ) এরা সন্তানকে পাপের মধ্যে রেখে প্রতিপালন করে। আবার কখনো সন্তানের সহায়তায় তারা পাপ কাজ করে। যেমন কিছু সংখ্যক পিতামাতা অবৈধ পণ্য বেচাকেনার কাজে সন্তানদের ব্যবহার করে। (গ) কিছু সংখ্যক পিতামাতা সন্তানের সামনে অবাধে নানা ধরনের অসামাজিক কাজ করে এবং সন্তানকেও অসামাজিক কাজে সহায়তা করে।

আধুনিকালে বিশেষত শহর এলাকায় দেখা যায়, কিছু সংখ্যক পিতামাতা উভয়ে চাকরি ও ব্যবসাসহ নানাবিধ কাজে দীর্ঘ সময় ঘরের বাইরে কাটান। ফলে সন্তান-সন্ততি তাদের স্নেহ-মমতা থেকে বঞ্চিত হয় এবং আচরণিক ক্ষেত্রে তারা বেপরোয়া

হয়ে ওঠে। কখনো বিবাহ বিচ্ছেদজনিত কারণে শিশু তার পিতা অথবা মাতাকে আবার কখনো উভয়কে হারায়। এর ফলে তারা মূলত অভিভাবকের স্নেহ-মমতা থেকে বঞ্চিত থেকে যায় এবং শিশুদের স্বাভাবিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়। এসব কারণে তারা সহসা অপরাধমূলক কাজে জড়িয়ে পড়ে। (Bhuiya 2009, 103)

কিশোর অপরাধের কারণ

কিশোরদের অপরাধী হয়ে ওঠার পেছনে অনেক কারণ নিহিত আছে। কয়েকটি বড় কারণ নিম্নে প্রদত্ত হলো -

১. **মনস্তাত্ত্বিক :** বয়ঃসন্ধিপ্রাপ্ত কিশোর-কিশোরীরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অসহনশীল ও ভীষণভাবে আবেগপ্রবণ থাকে। এ আবেগে ছেদ পড়লে তারা তা কোনোভাবে সহ্য করতে পারে না। ফলে তাদের জীবনে বিপর্যয় নেমে আসে। এটা একটি নিঃসন্দেহে মনস্তাত্ত্বিক বিষয়।

২. **অবহেলাজনিত :** কিশোর-কিশোরীদের অনেক কিছু সঠিকভাবে শেখানো হয় না। ফলে বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে তারা অসচেতন থেকে যায়। জীবনে অনেক কাম্য বস্তুও যে কখনো কখনো পাওয়া যায় না এবং এ না পাওয়াটাও যে স্বাভাবিক তা তাদের শেখানো হয় না। এটা এক ধরনের অবহেলা বটে। এর ফলে তারা অপরাধজগতে ঢুকে পড়ে।

৩. **মিথ্যা বলার প্রবণতা :** মাতাপিতার পারস্পরিক মতের অমিল ও বাসা-বাড়িতে অশান্তি মাথাচাড়া দিয়ে উঠলে কিশোর-কিশোরীরা কখনো কখনো মিথ্যা কথা বলার সুযোগ গ্রহণ করে। ফলে তাদের মাঝে সত্য ও মিথ্যার মাঝে ভেদ রেখাটি ক্রমশ মুছে যেতে থাকে। এভাবে তাদের মাঝে মিথ্যা বলার প্রবণতা ক্রমশবৃদ্ধি পেতে থাকায় তারা অপরাধ করেও মিথ্যা বলে পার পেয়ে যায়।

৪. **ধরাবাঁধা জীবন :** অতি অল্প বয়স থেকে কিশোরদেরকে একটা যান্ত্রিক রুটিনের আওতায় নিয়ে আসা হয়। সে যেন খাঁচায় আবদ্ধ পাখির ন্যায়। সে স্বাধীনভাবে বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে খেলাধুলাও করতে পারে না। ফলে তারা অপরাধপ্রবণ হয়ে ওঠে।

৫. **আর্থিক অসচ্ছলতা :** অপরাধপ্রবণতার জন্য দারিদ্র্য অনেকাংশে দায়ী। দরিদ্রতার তীব্র কশাঘাতে জর্জরিত পরিবারে কিশোর-কিশোরীরা তাদের মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণ করতে পারে না। ফলে তাদের মাঝে অপরাধপ্রবণতা সৃষ্টি হয় এবং তারা ধীরে ধীরে অপরাধজগতে প্রবেশ করে। দারিদ্র্যের কারণে কখনো কখনো কিশোরীরা পতিতাবৃত্তিকে পেশা হিসেবে বেছে নেয়। আবার কিশোররা চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, হত্যা, লুণ্ঠন ইত্যাদি অপরাধে জড়িয়ে পড়ে।

৬. **রাজনৈতিক কারণ :** তৃতীয় বিশ্বে রাজনৈতিক আশ্রয়-প্রশ্রয়ে সর্বাধিক অপরাধ সংঘটিত হয়। দল তাদেরকে নিজেদের উদ্দেশ্য হাসিলের অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে। রাজনৈতিক দলের লেজুড়বৃত্তির কারণে তারা ভালো ক্যারিয়ার গড়তে না

পারায় বেকার জীবনযাপনে বাধ্য হয়। কখনো বন্ধু-বান্ধবের খপ্পরে পড়ে আবার কখনো বাধ্য হয়ে তারা অপরাধজগতে ঢুকে পড়ে। এভাবে তারা নিজেরা যেমন অভিশপ্ত জীবনে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে তদ্রূপ সমাজের জন্যও বড় ধরনের বোঝা হয়ে দাঁড়ায় (Bhuiya 2009, 104)। ড. পঞ্চানন ঘোষাল নিম্নবর্ণিত কারণগুলোকে কিশোর অপরাধের কারণ হিসেবে দায়ী করেন- (ক) মানসিক সংঘাত; (খ) অসৎসঙ্গ; (গ) দুঃসাহসিকতা; (ঘ) এ্যাডভাঞ্চার প্রিয়তা; (ঙ) অত্যধিক ছায়াছবি প্রিয়তা; (চ) বিদ্যালয় সমস্যা; (ছ) অপছন্দনীয় কর্মস্থল; (জ) সঠিক বয়সে স্কুলে ভর্তি না হওয়া ; (ঝ) পিতামাতার কলহ-বিবাদ; (ঞ) পুনর্বিবাহ; (ট) পিতামাতার দুর্ব্যবহার; (ঠ) বিবাহ-বিচ্ছেদ; (ড) উন্মাদ পিতামাতা; (ঢ) মাদকাসক্তি; (ণ) খারাপ পরিবেশ। (Ghoshal 1999, 122)

কিশোর অপরাধ ও বাংলাদেশের সামাজিক চিত্র

বাংলাদেশে দিন দিন কিশোর অপরাধ বেড়েই চলছে। অপরাধজগতে কিশোর গ্যাংদের দৌরাত্ম বেড়েছে, বিভিন্ন এলাকা তাদের বলয় তৈরি হয়েছে। প্রতিদিনই সংবাদপত্রে কিশোর অপরাধ সংক্রান্ত সংবাদ প্রকাশিত হচ্ছে। এসব সংবাদ থেকে কিশোর অপরাধ জগতের চিত্র ও অবস্থা বোঝা যায়। দৈনিক প্রথম আলোতে গত ১৩ই জানুয়ারি 'এত কম বয়সী শিশুরাও হত্যায় জড়িত' নামে একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। তাতে বলা হয়, 'বুড়িগঙ্গার তীরে বেড়ানো শেষে বাসায় ফেরার পথে খুন হয় সিফাত (১২)। সিফাতের মৃত্যুর ঘটনায় তার নানা আজগর আলী ছয় শিশুর নাম উল্লেখ করে কামরাঙ্গীরচর থানায় হত্যা মামলা করেন। পুলিশ অভিযুক্ত ছয় শিশুকে গ্রেপ্তার করে ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট (সিএমএম) আদালতে পাঠায়। মামলার নথিপত্র বলছে, সিফাত খুনের অভিযোগে গ্রেপ্তার ৬ শিশুর মধ্যে ১০ বছর বয়সী শিশু আছে দুজন। বাকি ৪ জনের বয়সও মাত্র ১২। জানা গেছে, গত শুক্রবার সন্ধ্যায় বাসায় ফেরার পথে ১২ বছর বয়সী এক শিশুর পা মাড়িয়ে দেয় সিফাত। এ নিয়ে দুজনের মধ্যে কথা-কাটাকাটি হয়। একপর্যায়ে শিশুটি তার সঙ্গীদের নিয়ে সিফাতকে ধাওয়া করে ছুরিকাঘাত করে পালিয়ে যায়। পরে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সিফাতের মৃত্যু হয়। গত রোববার গ্রেপ্তার হওয়া ছয় শিশু সিফাত হত্যায় জড়িত থাকার কথা স্বীকার করে ১৬৪ ধারায় আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছে। সবাই এখন টঙ্গীর কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রে আছে। সিফাত হত্যায় জড়িত শিশুদের ব্যাপারে জানতে চাইলে কামরাঙ্গীরচর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, 'আমার চাকরিজীবনে এত কম বয়সী শিশুদের হত্যায় জড়িত থাকার ঘটনা পাইনি। সিফাত হত্যায় জড়িত সব শিশুর বয়স ১০ থেকে ১২ বছরের মধ্যে। এত কম বয়সী শিশুদের খুনের মতো জঘন্য অপরাধে জড়িয়ে পড়ার ঘটনা খুবই দুঃখজনক।' (*Prothom Alo*, Jan. 13, 2021)

কিশোর অপরাধ নিয়ে পুলিশের বক্তব্য তুলে ধরে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে বিবিসি বাংলা। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'বাংলাদেশের শিশু আইন ২০১৩ অনুযায়ী ১৮ বছর বা এর কম বয়সী যেসব শিশু-কিশোরের বিরুদ্ধে অপরাধের প্রমাণ পাওয়া যাবে তাদেরকে জেলে নেওয়ার পরিবর্তে উন্নয়ন কেন্দ্রে পাঠাতে হবে - যেন তারা সংশোধিত হয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে পারে। পুলিশের সাবেক অতিরিক্ত মহাপরিচালক মোখলেসুর রহমান বলেন, কাউকে আটক করা হলেও তাকে থানায় আলাদা কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে অন্য অপরাধীদের থেকে আলাদা রাখার নিয়ম রয়েছে। ২০১৯ সালের আগস্ট-সেপ্টেম্বরে কিশোর গ্যাং-কেন্দ্রিক বেশ কয়েকটি অপরাধ এবং খুনের ঘটনার পরই আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী বাড়তি পদক্ষেপ নেয়। এর পর ঢাকায় শুরু হয় কিশোর গ্যাং-বিরোধী অভিযান। একদিনেই অভিযান চালিয়ে আটক করা হয় শতাধিক কিশোরকে। এর মধ্যে শুধু হাতিরঝিল থানাতেই আটক করা হয় ৮৮ জনকে। পরে কিশোর গ্যাং-বিরোধী এ ধরনের অভিযানে ঢালাওভাবে কিশোরদের আটকের ঘটনার সমালোচনা হলে হাইকোর্টের নির্দেশে তা বন্ধ করে দেয়া হয়। এর আগে মঙ্গলবার পুলিশের মহাপরিদর্শক বেনজির আহমেদ এক অনুষ্ঠানে মন্তব্য করেছিলেন যে, বাংলাদেশে আইনের জটিলতা, জনবলের অভাব এবং অবকাঠামোর অভাবে কিশোর অপরাধ নিয়ন্ত্রণে আনা যাচ্ছে না। 'কিশোর অপরাধ করলে মোবাইল কোর্ট করা যেতো, এখন হাইকোর্ট বলেছে না এটা করা যাবে না। মোবাইল কোর্ট করা যাবে না, নরমাল আদালতে বিচার করা যাবে না, জেলে রাখা যাবে না, রাখবো কোথায়? বিচারে পাঠাবো কোথায়?' - বলেন বেনজির আহমেদ। তিনি বলেছিলেন, কিশোর অপরাধ দমনের জন্য পরিবারকে দায় নিতে হবে। পরিবার থেকেই সুশিক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বর্তমান কাঠামোতে শিশু বা কিশোর অপরাধ নিয়ন্ত্রণে কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। তবে এই সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে ওঠার জন্য অনেক সময় পদক্ষেপ নেয়া হলেও প্রশাসনিক জটিলতার কারণে বেশিরভাগ সময়েই তা সম্ভব হয় না। তিনি বলেন, প্রশাসনিক কিছু জটিলতার কারণে দেখা যায় যে, কোন এক কর্মকর্তাকে শিশু বা কিশোর অপরাধের ক্ষেত্রে কিভাবে ডিল করতে হবে সে বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে আনার পর হয়তো সে অন্য কোথাও বদলি হয়ে গেল। কিংবা ওই থানাতেই অন্য কোন দায়িত্বে চলে গেল। 'তখন আর ওই থানায় এ বিষয়ক প্রশিক্ষিত কোন কর্মকর্তা থাকে না' - বলেন তিনি। (*BBC Bangla*, Jan. 13, 2021)

অপরাধ বিজ্ঞানীরা বলছেন, সমাজ পরিবর্তনের কারণে পারিবারিক ও সামাজিক অনুশাসনচর্চার বিষয়টি ভেঙ্গে পড়েছে। যার কারণে সমাজে একটা শূন্য অবস্থা তৈরি হওয়ায় শিশু কিশোররা নেতিবাচক কাজে জড়িয়ে পড়েছে। তবে এর জন্য কোন ভাবেই কিশোর আইনের ধারা দায়ী নয়। বরং সারা বিশ্বেই এটি স্বীকৃত। 'আমি যদি বলি যে, আইনের কারণে এটি হচ্ছে - তাহলে সেটা কখনোই সঠিক নয়। এ কারণেই

নয়, কারণ ১৮ বছরের কম বয়সীদের সংশোধন করে সমাজে পুনর্বাসনের একটা সুযোগ দেয়ার সিদ্ধান্ত থাকে। আর এ জন্যই একে কিশোর অপরাধ বলে।' ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রিমিনোলজি বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক ড. জিয়া রহমান বলেন, কিশোর অপরাধের পেছনে পরিবার এবং আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর মতো সামাজিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের দায়বদ্ধতা রয়েছে। 'আমাদের স্কুল-কলেজ-ইউনিভার্সিটি, এলাকা ভিত্তিক সংগঠন, সবারই দায় রয়েছে। কেউই দায় এড়াতে পারে না।' (Ibid.)

সমাজ বিজ্ঞানীরা বলছেন, আধুনিক সমাজে পরিবার ভেঙে ছোট পরিবার গঠন এবং জীবনযাত্রা ব্যক্তিকেন্দ্রিক হয়ে পড়াটাও শিশু-কিশোরদের মধ্যে অপরাধ প্রবণতা বেড়ে যাওয়ার একটা বড় কারণ। এ বিষয়ে সমাজবিজ্ঞানী মাহবুবা নাসরীন বলেন, শিশু কিশোরদের খেলাধুলার সুযোগ কমে যাওয়া, বিভিন্ন ধরনের সুন্দর বিনোদনের সুযোগ কমে যাওয়া এবং সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অংশ না নেওয়াও অপরাধ-প্রবণতার বড় কারণগুলোর অন্যতম। এমন অবস্থায় পরিবারের পাশাপাশি, সামাজিক সব সংগঠনকে এগিয়ে আসতে হবে বলে মনে করেন তিনি। (Ibid.)

সমাজে কিশোর অপরাধ ও মামলা কী পরিমাণে বাড়ছে তার একটি জরিপভিত্তিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে দৈনিক সমকাল। প্রতিবেদনটির গুরুত্বপূর্ণ অংশ এখানে তুলে ধরা হলো। 'কিশোর অপরাধ : এক বছরে মামলা বেড়েছে ৩৪%' শিরোনামের প্রতিবেদনটিতে বলা হয়েছে, দেশে কিশোর অপরাধী কী হারে বাড়ছে, তার একটি সাম্প্রতিক তথ্য পুলিশের রেকর্ডকৃত পরিসংখ্যান থেকে জানা যায়। পুলিশ সদর দপ্তরের তথ্য বলছে, ২০১৬ সালে কিশোর অপরাধের ঘটনায় সারাদেশে মামলা রেকর্ড হয়েছে এক হাজার ৫৯৬টি। ২০১৫ সালে এ সংখ্যা ছিল এক হাজার ১৮৪টি। এ হিসাবে এক বছরে কিশোর অপরাধের মামলা বেড়েছে প্রায় ৩৪ শতাংশের বেশি। বর্তমানে শিশু-কিশোর সংশোধনী কেন্দ্রে আছে ৫৯৮ ও কারাগারে রয়েছে ৩৫ জন। সব মিলিয়ে ৬৩৩ জন কিশোর চার দেয়ালে বন্দি। ২০১৩ সালের শিশু আইন অনুযায়ী, ৯ থেকে অনূর্ধ্ব ১৮ বছরের কোনো ছেলেশিশু অপরাধে জড়ালে তাদের গাজীপুরের টঙ্গী ও যশোরের পুলেরহাটের কিশোর (বালক) উন্নয়ন কেন্দ্রে রাখা হয়। বর্তমানে সেখানে থাকা কিশোরদের মধ্যে ১২০ জন হত্যা মামলার আসামি। ১৪২ জন নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে দায়ের করা মামলায় অভিযুক্ত। বাকিরা চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, মাদক ও অস্ত্র মামলায় অভিযুক্ত। পুলিশ সদর দপ্তরের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০১৬ সালে দেশে কিশোর অপরাধের ঘটনায় মোট অভিযুক্তের সংখ্যা ছিল দুই হাজার ১৭৯ জন। ওই সময়ে কিশোর অপরাধ-সংক্রান্ত এক হাজার ৪২২টি মামলার চার্জশিট দেওয়া হয়েছে। এতে মোট আসামির সংখ্যা এক হাজার ৮৬৭ জন। ২০১৫ সালে কিশোর অপরাধ-সংক্রান্ত এক হাজার ১৮৪টি মামলায় আসামি ছিল এক হাজার ৭১৯ জন। ২০১৪ সালে মামলা হয়েছে ৮১৮টি, আসামির সংখ্যা এক হাজার ২৬৩। ২০১৩ সালে কিশোর অপরাধের ৫৮৯

মামলায় আসামি ৮৪৮ জন। ২০১২ সালে ৪৮৪ মামলায় আসামির সংখ্যা ৭৫১ জন। বর্তমানে কিশোর অপরাধের ঘটনায় সারাদেশে বিচারাধীন মামলা আছে এক হাজার ২৮২টি। ২০১৬ সালে বিচার নিষ্পন্ন ২৯টি মামলায় খালাস পেয়েছে ৪৭ জন। ছয় মামলায় সাজা হয়েছে সাতজনের। তদন্তাধীন মামলা রয়েছে ১১১টি। শিশু ও কিশোর সংশোধনী কেন্দ্রে অভিযুক্ত কিশোরের সংখ্যাও বাড়ছে। ২০১২ সালে সেখানে ছিল ২২৩, ২০১৩ সালে ২৫৯, ২০১৪ সালে ৩০১, ২০১৫ সালে ৪৩৮ এবং ২০১৬ সালে ৫৯৮ জন কিশোর। (*Samakal*, Sep. 16, 2017)

কিশোর অপরাধের প্রভাব

অপরাধের সঙ্গে জড়িত হওয়ার কারণে কিশোরেরা সমাজের ওপর বিভিন্ন নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। চুরি ও ছিনতাই, হামলা ও চাঁদাবাজি, মাদকাসক্তি ও যৌনাচার, ইভটিজিং ও হয়রানি, খুন ও ভাংচুর ইত্যাদি অপরাধ আলাদা রূপ নিয়ে সমাজের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়ে। দৈনিক ইনকিলাবে 'মাদকাসক্ত লাখ লাখ শিশু-কিশোর' শিরোনামে একটি প্রতিবেদনে বলা হয়, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, দেশে মাদকাসক্তের সংখ্যা ৭০ লাখ। তার মধ্যে শিশু ও কিশোর মাদকাসক্ত রয়েছে ৪ লাখের অধিক। তবে বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থার হিসাব মতে, এই সংখ্যা আরো বেশি। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর সূত্রে জানা গেছে, শিশু ও কিশোররা প্রথমে সিগারেট দিয়ে নেশার জগতে প্রবেশ করে। এরপর তারা আস্তে আস্তে ফেনসিডিল ও ইয়াবাসহ বিভিন্ন মাদকে আসক্ত হয়। তবে পথশিশু বা বস্তির শিশুদের মধ্যে ড্যান্ডি নামক মাদকে আসক্ত। জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট সূত্র মতে, ঢাকা বিভাগে মাদকাসক্ত শিশুর প্রায় ৩০ শতাংশ ছেলে এবং ১৭ শতাংশ মেয়ে। মাদকাসক্ত ১০ থেকে ১৭ বছর বয়সী ছেলে এবং মেয়ে শিশুরা শারীরিক ও মানসিকভাবে প্রচণ্ড ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। চিকিৎসকদের মতে, মাদকাসক্ত শিশু ও কিশোররা বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়। শিশু মাদকাসক্তের বিষয়ে জানতে চাইলে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের এক কর্মকর্তা জানান, দেশে শিশু ও কিশোর মাদকসেবীর সংখ্যা প্রায় ৪ লাখ। এদের মধ্যে ৪৪ শতাংশই হচ্ছে পথশিশু। তিনি আরো জানান, ওই শিশু মাদকসেবীরা বেশি বসবাস করে বস্তিতে, গ্রামে অথবা রাস্তার ধারে। শিশুরা যাতে মাদক সেবন না করে এ জন্য পরিবারকে সচেতন করার জন্য মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে প্রচারণা চালানো হয়। (*Inqilab*, Dec. 6, 2017)

কিশোর অপরাধের প্রবণতা দেশ, জাতি ও সমাজের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাকে নষ্ট করে দিচ্ছে। কিশোর অপরাধের প্রভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শান্তি-শৃঙ্খলার অবনতি ও শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ নষ্ট হয়। শিশু-কিশোর দ্বারা রাস্তাঘাটে প্রকাশ্যে ছিনতাই, চাঁদাবাজি, পকেটমারের মতো অপরাধ জনগণের আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তায় বিঘ্ন ঘটায়। ছাত্রী অপহরণ, ধর্ষণ, এসিড নিক্ষেপ ইত্যাদি কারণে স্কুল-কলেজগামী ছাত্রীরা

নিরাপত্তাহীন হয়ে পড়ে। কিশোর অপরাধের কারণে সমাজে মাদকাসক্তি ও যৌনাচার বেড়েই চলেছে যা সমাজজীবনে নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটাচ্ছে। এ ছাড়া কিশোরদের দ্বারা পিতা-মাতা ও বয়োজ্যেষ্ঠদের অবাধ্যতা, অশোভন আচরণ, পারিবারিক জীবনে শৃঙ্খলা নষ্ট হচ্ছে। সর্বোপরি কিশোরদের অর্থবহ জীবনকে ধ্বংস করে জাতিকে অন্ধকারাচ্ছন্ন ভবিষ্যতের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

কিশোর অপরাধ প্রতিরোধের উপায়

কিশোরকাল অনেকটা স্বাপ্নিক ও কৌতূহলোদ্দীপক হয়ে থাকে। এসময় কিশোর-কিশোরীরা জানতে চায় এবং অপরকে জানাতেও চায়। এতে হোঁচট খেলে তারা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে এবং অপরাধপ্রবণ হয়ে ওঠে। এ অপরাধ প্রতিরোধ একান্তভাবে প্রত্যাশিত। দেশ ও আইনভেদে কিশোর অপরাধ প্রতিরোধের উপায় অভিন্ন নাও হতে পারে। তবে একটি বিষয়ে সমাজবিজ্ঞানীদের মধ্যে ঐকমত্য রয়েছে। আর তা হলো শিশু-কিশোরদের সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়াকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করা উচিত যাতে কিশোর অপরাধের মূল কারণগুলো মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে না পারে। এ লক্ষে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, সমষ্টিকে শিশু-কিশোরদের সামাজিকীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। এবার দেখা যাক কীভাবে কিশোরদেরকে অপরাধ থেকে রক্ষা করা যায়।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান : কিশোর-কিশোরীরা দিনের একটি বিরাট অংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অবস্থান করে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের রীতিনীতি, আচার-আচরণ, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের আচার-ব্যবহার, দৃষ্টিভঙ্গি, সিলেবাস-কারিকুলাম ইত্যাদি কিশোর-কিশোরীদের মানস গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এছাড়াও শিশু-কিশোরদের মানস গঠনে শিক্ষকদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। কাজেই সর্বাগ্রে শিক্ষকদের আদর্শবান হতে হবে। এর ফলে শিশু-কিশোররা নৈতিকমূল্যবোধে উজ্জীবিত হবে। বর্তমানে কিশোররা যে বিপথগামী হচ্ছে তার মূলে রয়েছে নৈতিক শিক্ষার অনুশীলনের অভাব এবং কতিপয় শিক্ষকের অনৈতিক কর্মকাণ্ড। সুতরাং কিশোরদেরকে সুনাগরিকরূপে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ভূমিকা অপরিসীম।

টিনএজ অপরাধ প্রতিরোধে ভূমিকা পালন

বয়ঃসন্ধিকালে কিশোর-কিশোরীদের মনোজগতে যে আমূল পরিবর্তন সূচিত হয় সেবিষয়ে অভিভাবকদের মনোযোগ দিতে হবে, যাতে তারা অপরাধ জগতে প্রবেশের সুযোগ করে নিতে না পারে।

ধর্মীয় সংস্কৃতি অনুশীলনের মাধ্যমে

মানুষের যেমন দেহ সত্তা আছে তদ্রূপ তার মনন সত্তাও রয়েছে। এ মননসত্তার বিকাশ একান্ত প্রয়োজন। আর ধর্ম সেই কাজই করে। পৃথিবীর সূচনাকাল থেকে যে সব ধর্মের সন্ধান পাওয়া যায় এবং যত ধর্মগুরু এসেছেন তাঁরা সবাই সত্যের পক্ষে

এবং অন্যায়ের বিপক্ষে আপসহীন ছিলেন। প্রতিটি ধর্ম-দর্শনই তার অনুসারীদেরকে সৎপথে চলার, সুন্দরভাবে বাঁচার ও মানবকল্যাণে কাজ করার শিক্ষা দেয়। সুতরাং শৈশব থেকে নিজ নিজ ধর্ম চর্চার মাধ্যমে শিশু, কিশোর, যুবক ও বৃদ্ধ এককথায় সকল মানুষকে বিপথগামিতা থেকে রক্ষা করা যেতে পারে।

আইন প্রয়োগকারী সংস্থার করণীয়

আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে শিশু ও কিশোরদের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। পুলিশ প্রশাসন শিশু ও কিশোরদের জন্য বিভিন্ন কল্যাণমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন। ফলে পুলিশের প্রতি তাদের মনোভাব সহানুভূতিশীল ও হৃদ্যতাপূর্ণ হবে। এর ফলে তারা অপরাধ জগত থেকে নিজেদের রক্ষা করার সুযোগ পাবে। (Sadek 1989, 125)

ড. পঞ্চানন ঘোষাল কিশোর অপরাধ প্রতিরোধে পরিবারের দায়িত্বের প্রতি সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করেছেন। নিম্নে তাঁর প্রস্তাবগুলো উল্লেখ করা হলো-

(ক) গ্রহণীয় : শিশু-কিশোরদের বুঝতে দিতে হবে, তারা পিতামাতার পছন্দমত চলে বিধায় তারা তাদের ভালোবাসেন তা নয়। পিতামাতার নির্দেশ অনুযায়ী কাজ না করলেও তারা তাদের ভালোবাসেন ও পছন্দ করেন।

(খ) নিয়ন্ত্রণ : শিশু-কিশোরদের এমন শিক্ষা দিতে হবে যাতে তারা তাদের কার্যকলাপ একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে নিবদ্ধ রাখে এবং সীমার বহির্ভূত কাজ করলে যে তা অন্যায়ের পর্যায়ে পড়ে তা বুঝতে সক্ষম হয়।

(গ) বোধনীয় : শিশু-কিশোরদের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট নৈতিক মানের সৃষ্টি করতে হবে এবং তাদেরকে উচিত-অনুচিত, ভালো-মন্দের প্রভেদ বুঝতে দিতে হবে।

(ঘ) সাহায্য : পিতামাতাকে প্রত্যেক শিশু-কিশোরের আস্থাভাজন হতে হবে। সন্তানরা যাতে নিজের ও অপরের কল্যাণ সাধন করতে পারে সেজন্য তাদের সাহায্য করতে হবে।

(ঙ) বিশ্বাস : কাকে বিশ্বাস করা উচিত এবং কাকে বিশ্বাস করা উচিত নয়- সেবিষয়ে তাদের সুস্পষ্ট ধারণা দিতে হবে।

(চ) প্রশংসা : শিশু-কিশোরদের প্রতিটি প্রশংসনীয় কাজের স্বতঃস্ফূর্ত স্বীকৃতি দিতে হবে।

(ছ) নিরাপত্তা : শিশু-কিশোররা যেন উপলব্ধি করে যে, তাদের ঘর তাদের জন্য সর্বাপেক্ষা নিরাপদ স্থান।

(জ) সুরক্ষা : শিশু-কিশোররা যেন বিশ্বাস করে যে, তাদের পিতামাতা তাদের সকল ক্ষেত্রে সুরক্ষা দিবেন।

শিশু-কিশোরদের সরল ভাষায় বোঝাতে হবে। তারা অনুকরণপ্রিয়। এজন্য তারা কুপরিবেশ ও সুপরিবেশ দ্বারা খুব সহজেই প্রভাবিত হয়। কাজেই সব ধরনের অপরাধ মূলক কাজ থেকে তাদের সরিয়ে রাখতে হবে।

(ঝ) স্বাধীনতা : একটি নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে শিশু-কিশোরদের পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া উচিত এবং অপরিহার্য না হলে তাদের কাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা উচিত নয় (Sadek 1989, 373-375)।

উল্লেখ্য, এ প্রবন্ধে এটা বলা হচ্ছে না যে, শিশু-কিশোরের সব ইচ্ছা ও আবদার যাচাই-বাছাই না করে বিনা বাক্যে মেনে নিতে হবে। আমাদের উচিত তাদেরকে নিয়মিত সময় ও সাহচর্য দেওয়া। ব্যস্ততার অজুহাতে তাদেরকে পিতৃ ও মাতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত করা কোনোভাবে সমীচীন নয়। পিতামাতা যদি সন্তান প্রতিপালনে যথাযথ দায়িত্ব পালন করেন তবে কিশোর সমাজ ধ্বংসাত্মক অবস্থা থেকে রক্ষা পাবে। তাই যে কোনো মূল্যে পিতামাতাকে তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে হবে।

ইসলামের দৃষ্টিতে কিশোর অপরাধ প্রতিরোধের উপায়

শিশু-কিশোররা মূলত কাদামাটির সঙ্গে তুলনীয়। একজন শিল্পী কাদামাটিকে যেভাবে রূপ দিতে চান সেভাবেই গড়ে তুলতে পারেন। পিতামাতাও তাদের সন্তানদেরকে যেভাবে গড়ে ওঠাতে চান কতিপয় ব্যতিক্রম ছাড়া সেভাবেই তাদের গড়ে তোলা সম্ভব। এ ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা পরিবারের সদস্যদের মধ্যে যারা বয়সে বড় তাদের। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক হতে হবে হৃদ্যতাপূর্ণ। পিতামাতা তাদের ভবিষ্যত স্বপ্ন সম্পর্কে জানবেন এবং তাদেরকে সুচিন্তিত মতামত দিবেন। তাদের অমতে কিছু চাপিয়ে না দিয়ে বরং তাদের বুঝিয়ে মতামত দিবেন। আমাদের মনে রাখতে হবে, তারা মহান আল্লাহর নিয়ামত। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ٱلْمَالُ وَٱلْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَاةِ ٱلدُّنْيَا وَٱلْبَاقِيَاتُ ٱلصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَاباً وَخَيْرٌ أَمَلاً-﴾

ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি পার্থিব জীবনের শোভা এবং স্থায়ী সৎকর্ম তোমার প্রতিপালকের কাছে পুরস্কার প্রাপ্তির জন্য শ্রেষ্ঠ এবং কাঙ্ক্ষিত হিসেবে উৎকৃষ্ট"। (Al-Qurān, 18:46)

মহান আল্লাহ আরো বলেন,

﴿يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلاَئِكَةٌ غِلاَظٌ شِدَادٌ لاَّ يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾-

হে মুমিনগণ! তোমরা নিজদেরকে ও তোমাদের পরিবার-পরিজনকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করো, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর; যাতে নিয়োজিত আছে নির্মমহৃদয় ফেরেশতাগণ, যারা অমান্য করে না, যা আল্লাহ তাদের আদেশ করেন। আর তারা যা করতে আদিষ্ট হয় তাই করে (Al-Qurān, 66:6)

পিতামাতা সন্তান প্রতিপালনে অবহেলা করলে তাদেরকে আখিরাতে কঠোর শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿رَبَّنَآ أَرِنَا ٱللَّذَيْنِ أَضَلاَّنَا مِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلإِنسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ ٱلأَسْفَلِينَ﴾

হে আমাদের প্রতিপালক! যে সব জিন্ন ও মানুষ আমাদের পথভ্রষ্ট করেছিল তাদের উভয়কে দেখিয়ে দাও, আমরা উভয়কে পদদলিত করবো, যাতে তারা লাঞ্ছিত হয় (Al-Qurān, 41:29)।

মহানবী ﷺ বলেছেন,

مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، أَوْ يُمَجِّسَانِهِ،

প্রতিটি শিশু ফিতরাতের (ইসলাম) ওপর জন্মগ্রহণ করে। অতঃপর তার পিতামাতা তাকে ইয়াহূদী অথবা খ্রিস্টান অথবা অগ্নিপূজারী বানায়। (Al-Bukhārī 1987, 1358)

তিনি আরো বলেছেন,

مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَلَدًا مِنْ نَحْلٍ أَفْضَلَ مِنْ أَدَبٍ حَسَنٍ

পিতা তার সন্তানকে যা দান করে তন্মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হচ্ছে নৈতিক আচরণ (Al-Tirmīdhī 1998, 1952)।

আর এজন্য পরিবারকে বলা হয় মানবজীবনের প্রধান বুনিয়াদ। বিশিষ্ট জার্মান শিক্ষাবিদ Friedrick Forbel এর একটি উপদেশ এক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন, "হে শিশুর পিতা! শিশুর প্রতি কঠোর হয়ো না। তার পুনঃপুন প্রশ্নবাণে অস্থিরতা প্রকাশ করো না। প্রতিটি কঠোর শব্দের আঘাতে তার জীবনের ফুলের পাপড়িগুলো নষ্ট করে দেয়, জীবনতরুর শাখা বিনষ্ট করে দেয়" (Bhuiya 2009, 114)।

আলী রা বলেন, "পিতার ওপর পুত্রের যেরূপ অধিকার রয়েছে, পুত্রের ওপরও পিতার তেমন অধিকার রয়েছে। পিতার অধিকার হলো, পুত্র শুধু আল্লাহকে অমান্য করার আদেশ ব্যতীত তার সকল আদেশ মেনে চলবে। আর পুত্রের অধিকার হলো, পিতা তার একটি সুন্দর নাম রাখবেন, তাকে উত্তম প্রশিক্ষণ দিবেন এবং কুরআন শেখাবেন' ('Alī 2000, 117)।

বর্তমান সময়ে বেশিরভাগ পিতামাতাকে সন্তানের ব্যাপারে আক্ষেপ করতে শোনা যায়। কিন্তু এর মূলে কী কারণ রয়েছে সেব্যাপারে তারা খতিয়ে দেখা খুব একটা জরুরি মনে করেন না। সন্তানকে অনৈতিকতার ছোবল থেকে রক্ষার লক্ষে নিম্নোক্ত কাজগুলো করতে পারেন। যেমন -

(ক) পারিবারিক বৈঠক : পরিবারের সদস্যগণ আমাদের সবচেয়ে আপন। তাদেরকে সত্যিকারার্থে মানুষ রূপে গড়ে তোলার জন্য আমাদের সময় দিতে হবে। আর সেলক্ষে সপ্তাহে কম পক্ষে একদিন তাদের নিয়ে বসা যেতে পারে। আমরা অনেকে হয়ত বাইরে অপর কারো সন্তানকে মানুষ রূপে গড়ে তোলার লক্ষে সময় দেই ঠিকই কিন্তু নিজ পরিবারে সময় দিই না। এটা আত্মঘাতী কাজ। অথচ মহান আল্লাহ বলেন-

﴿وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ﴾

তোমার নিকট আত্মীয়-স্বজনকে সতর্ক করে দাও। (Al-Qurān, 26:214)

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلْإِنسَٰنُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَٰقِيهِ﴾-

হে মানুষ! তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট পৌঁছা পর্যন্ত কঠোর পরিশ্রম করে থাক, পরে তুমি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে। (Al-Qurān, 86:06)

এর ফলে শিশুদের সমস্যা সম্পর্কে জেনে সমাধান দেওয়া সম্ভব হবে এবং তারা যাতে অপরাধ জগতে প্রবেশ করতে না পারে তা নিয়ন্ত্রণ করা অনেকাংশে সম্ভব হবে।

(খ) একাডেমিক ও অন্যান্য পড়ালেখা : সন্তান সত্যিকার মানুষরূপে গড়ে উঠুক– এ প্রত্যাশা সকলের। কিন্তু আমরা কি লক্ষ করি, আমাদের সন্তানরা পাঠ্য বই পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আর কি কি বই পড়ে? তাদের পড়ার টেবিলে কি ইসলামী বই-পুস্তক আছে? সন্তানকে সত্যিকার মানুষরূপে গড়ে তোলার লক্ষে কুরআন-হাদীস পড়ানোর কোনো বিকল্প নেই। এব্যাপারে অবহেলা আত্মঘাতী কাজ। কুরআনের প্রথম বাণী হচ্ছে-

﴿ٱقْرَأْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلَّذِى خَلَقَ﴾

পড়ো, তোমার প্রতিপালকের নামে, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। (Al-Qurān, 96:1)

এ আয়াতে আমাদের সিলেবাস বলে দেওয়া হয়েছে। এ সিলেবাস অনুসরণে রয়েছে ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তি। কাজেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সিলেবাসভুক্ত বইয়ের সঙ্গে নৈতিক শিক্ষাও বাধ্যতামূলক করতে হবে।

(গ) ইলেকট্রনিক মিডিয়া নিয়ন্ত্রণ : ইলেকট্রনিক মিডিয়ার যথেচ্ছ ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করতে হবে এবং পরিবারের সকল সদস্যকে সর্বপ্রকার অশ্লীলতা বর্জন করতে হবে। অনেক পিতামাতা গিফ্‌ট হিসেবে কিশোরদের হাতে দামি মোবাইল তুলে দেন। তারা কি লক্ষ রাখেন যে, কিশোররা এগুলো দিয়ে সত্যিই কি পড়ালেখার সহায়ক হিসেবে ব্যবহার করে, না নিজেদের ধ্বংস করে দিচ্ছে ? এসকল ডিভাইজে যেসব অশ্লীল ছবি প্রদর্শিত হয় তা দেখে সহসা কিশোররা অপরাধ জগতে ঢুকে পড়ে। এব্যাপারে পিতামাতাকে অতন্দ্র প্রহরীর ন্যায় ভূমিকা পালন করতে হবে। নতুবা তাদের অপরাধ জগত থেকে রক্ষা করা যাবে না।

(ঘ) ইসলামী অনুষ্ঠানমালায় অংশগ্রহণ : আমাদের দেশে ইসলাম সম্পর্কে জানার যেসব মাধ্যম আছে তন্মধ্যে দীনী প্রোগ্রামসমূহ অন্যতম। পিতা তার কিশোর সন্তানকে তাতে নিয়ে যেতে পারেন এবং নিয়ে যেতে পারেন তার স্ত্রী ও কন্যা সন্তানকেও। এতে তাদের নৈতিকতার ভিত মজবুত হবে এবং তারা নিজেদেরকে সর্ববিধ অপরাধ থেকে বিরত থাকার অনুপ্রেরণা লাভ করবে।

(ঙ) মৌলিক ইবাদতের ব্যাপারে যত্নবান হওয়া : অনেক পিতামাতা সন্তান এখনো ছোট-এরূপ আত্মঘাতী কথা বলে কিশোরদের দীন শিক্ষা ও মৌলিক ইবাদতের ব্যাপারে খুব একটা গুরুত্ব দিতে চান না। কিন্তু এরাই যখন বেড়ে ওঠে, কখনো কখনো দেখা যায়, উক্ত ইবাদত পরিপালন দূরে থাক, তারা এসব ইবাদতের

ঘোর বিরোধিতায় লিপ্ত হয়ে পড়ে। এ কিশোর সন্তানই এক সময় অপরাধ জগতে ঢুকে গেলে আশ্চর্য হওয়ার কিছু থাকবে না।

(চ) সন্তানের বন্ধু-বান্ধবের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন : আমাদের স্কুল-কলেজ ও মাদরাসাগামী ছেলে-মেয়েদের বন্ধু-বান্ধব কারা-আমরা কি কখনো তার খবর নিই? তারা কি চরিত্রহারা, না উন্নত চরিত্রের কেউ? বর্তমান সময় আমাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে যে, কোনো কোনো সহপাঠী অপর সহপাঠীর জীবনের জন্য কত ভয়াবহ হতে পারে। কাজেই সন্তানের বন্ধু-বান্ধবের ব্যাপারে অভিভাবকদের খোঁজ-খবর রাখতে হবে। এব্যাপারে আমাদের অসচেতনতা ভয়াবহ পরিণাম ডেকে আনতে পারে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ٱلْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ-﴾

বন্ধুরা সেদিন একে অপরের শত্রু হবে, কেবল মুত্তাকীরা ব্যতীত। (Al-Qurān, 43:67)

নবী ﷺ বলেছেন,

الرَّجُلُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ، فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ

মানুষ তার বন্ধুর স্বভাব-চরিত্রেই প্রভাবিত হয়ে থাকে। সুতরাং তোমাদের প্রত্যেকের লক্ষ রাখা উচিত, সে কার সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করবে। (Al-Tirmīdhī 1998, 2378)

নবী ﷺ আরো বলেছেন,

مَثَلُ الجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالجَلِيسِ السَّوْءِ، كَمَثَلِ صَاحِبِ المِسْكِ وَكِيرِ الحَدَّادِ، لاَ يَعْدَمُكَ مِنْ صَاحِبِ المِسْكِ إِمَّا تَشْتَرِيهِ، أَوْ تَجِدُ رِيحَهُ، وَكِيرُ الحَدَّادِ يُحْرِقُ بَدَنَكَ، أَوْ ثَوْبَكَ، أَوْ تَجِدُ مِنْهُ رِيحًا خَبِيثَةً

সৎ সঙ্গী ও অসৎ সঙ্গীর উপমা হলো আতর বিক্রেতা ও কামারের মত। আতর বহনকারী হয়ত তোমাকে কিছু দান করবে অথবা তুমি তার নিকট থেকে কিছু কিনবে অথবা তার থেকে সুগন্ধ পাবে। পক্ষান্তরে কামারের হাঁপরের ফুলকি হয়ত তোমার কাপড় পুড়িয়ে দিবে অথবা সেখান থেকে তুমি দুর্গন্ধ পাবে। (Al-Bukhārī 1987, 2101)

মানুষ সামাজিক জীব হিসেবে একাকী চলতে পারে না। তাকে কারো না কারো সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করে বসবাস করতে হয়। তবে বন্ধুত্ব স্থাপনের সময় লক্ষ রাখতে হবে, কাকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করা হচ্ছে। কোনো অবস্থায় দুষ্ট লোককে বন্ধুরূপে গ্রহণ করা যাবে না। কেননা নবী ﷺ বলেছেন,

الجليس الصالح خير من الوحدة والوحدة خير من جليس السوء-

নেককার বন্ধুর সাহচর্য একাকিত্বের চেয়ে ভালো। আর বদকার বন্ধুর সাহচর্যের চেয়ে একাকী থাকা ভালো। (Ibn Abī Shaybah 1409H, 34819)

(ছ) উপার্জন : পিতামাতা হালাল উপার্জন করবেন, কোনো অবস্থায় হারাম উপার্জন করবেন না এবং উপার্জনে হালাল-হারামের বিষয় সম্পর্কে পরিবারের সকলকে সুস্পষ্ট ধারণা দেবেন। কারণ রিযক হারাম হলে ইবাদত কবুল হয় না। আর

যাদের ইবাদত কবুল হয় না তাদের ঔরষে সুসন্তান জন্মগ্রহণ করে না। মহান আল্লাহ হালাল রিযকের ব্যাপারে বলেন,

﴿يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُحَرِّمُواْ طَيِّبَاتِ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ لاَ يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ وَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلاَلاً طَيِّباً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِيۤ أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ﴾

হে মুমিনগণ! আল্লাহ তোমাদের জন্য উৎকৃষ্ট যেসব বস্তু হালাল করেছেন সেই সমুদয়কে তোমরা হারাম করো না এবং সীমালঙঘন করো না। নিশ্চয় আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না। আল্লাহ তোমাদেরকে যে হালাল ও উৎকৃষ্ট জীবিকা দিয়েছেন তা থেকে ভক্ষণ করো এবং ভয় করো আল্লাহকে, যাঁর প্রতি তোমরা ঈমান এনেছ। (Al-Qurān, 5:87-88)

উপরোক্ত আয়াতে উৎকৃষ্ট বস্তু দ্বারা হালাল বস্তু ও হালাল উপায়ে অর্জিত উপার্জনকে বোঝানো হয়েছে। আর যারা হারাম উপায়ে উপার্জন করে তাদের সীমালঙ্ঘনকারী বলা হয়েছে।

মোটকথা, পিতামাতা যদি সন্তানকে সত্যিকার মানুষরূপে গড়ে তুলতে চান, তবে সকল শিক্ষা প্রদানের পূর্বে আল্লাহ ও তাঁর নবী ﷺ প্রদত্ত শিক্ষায় পরিপুষ্ট করে তুলতে হবে এবং তাদের পেছনে সময় দিতে হবে। এ শিক্ষা ছাড়া সন্তানকে অপরাধমুক্ত রাখা কোনোভাবে সম্ভব নয়। এ লক্ষে পিতামাতাগণ সূরা লুকমানে বর্ণিত ১৩-১৯ আয়াত অনুসরণে নিজ নিজ সন্তানদের গড়ে তুলতে পারেন।

আন্তর্জাতিক ও জাতীয় শিশুনীতি

জাতিসংঘ গৃহীত সনদের The United Nations Convention on the Right of the Child (CRC) ১৯৮৯ এর আগে League of Nations ১৯২৪ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক পর্যায়ে শিশু অধিকারের ওপর শিশু অধিকার সংক্রান্ত 'জেনেভা ঘোষণা 'নামে একটি ঘোষণা প্রদান করে। ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হলে 'লীগ অব নেশনস' অকার্যকর হয়ে যায়। ১৯৪৫ সালের ২৪ অকটোবর জাতিসংঘ গঠিত হলে ১৯৪৬ সালে শিশু অধিকার সংক্রান্ত 'জেনেভা ডিক্লারেশন' পুনরুজ্জীবিত হয়। ১৯৪৮ সালে সর্বজনীন মানবাধিকারের আওতায় ১৯৪৬ সালের ২০ নভেম্বর উক্ত 'জেনেভা ঘোষণা'এর স্থলে শিশুদের অধিকার সংক্রান্ত জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ জরুরি ও যুদ্ধকালীন নারী ও শিশুদের রক্ষাকল্পে ৩৩১৮ নং সিদ্ধান্তবলে আরো একটি ঘোষণা গৃহীত হয়। এছাড়া ১৯৭৪ সালের ১৪ ডিসেম্বর জাতিসংঘের ঘোষণা আসে। পরে ১৯৭৯ সালে 'জাতিসংঘ মানবাধিকার কমিশন' শিশু অধিকারের ওপর একটি পূর্ণাঙ্গ সনদের খসড়া তৈরি করে (Raheem 2012, 11-13)। ১৯৮৯ সালের ২০ নভেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৪৪/২৫ নং সিদ্ধান্তের মাধ্যমে শিশু অধিকার সনদ ঐকমত্যের ভিত্তিতে গৃহীত এবং ১৯৯০ সালের ২ সেপ্টেম্বর থেকে 'আন্তর্জাতিক শিশু অধিকার সনদ কার্যকর হয়। (Shishu Bishyakosh 1997, 5/164-165)

১৯৯০ সালে জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ ১৯৮৯ এ স্বাক্ষর ও অনুসমর্থনকারী প্রথম রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। এরপর ১৯৯৪ সালে 'জাতীয় শিশুনীতি' (National Children Policy) প্রণয়ন করা হয়। এর ফলে শিশু মৃত্যুহার হ্রাসে সহস্রাব্দ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বাংলাদেশের সাফল্যের জন্য জাতিসংঘ কর্তৃক মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে UN Millennium Award 2010 প্রদান করা হয় (Jatyo Shishu Niti 2011, 3)। বাংলাদেশের শিশুদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বিনির্মাণে একটি সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা গ্রহণের উদ্দেশে জাতীয় শিশুনীতি ২০১১ ঘোষণা করা হয়। জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ বাস্তবায়নের নিমিত্ত শিশু আইন রহিতক্রমে শিশু আইন ২০১৩ প্রণীত হয় এবং ২০১৩ থেকে আইনটি বাস্তবায়ন শুরু হয় (Shishu Ain, 2013)।

সুপারিশমালা

১. **পাঠ্যক্রম ও শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার সাধন :** বর্তমান বিশ্বব্যবস্থায় সবার জন্য শিক্ষার সুযোগ অবারিত রাখার কথা বলা হচ্ছে। সেলক্ষ্য অর্জনের জন্য পাঠ্যক্রম ও সিলেবাস প্রণয়নের সময় শিক্ষার্থীর বয়স ও সামর্থ্যের প্রতি লক্ষ রেখে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করতে হবে।

২. **দারিদ্র্য দূরীকরণে সমন্বিত উদ্যোগ :** দারিদ্র্য মানুষকে অপরাধপ্রবণ করে তোলে। তাই দারিদ্র্য বিমোচনে পরিবার, সমাজ, অর্থনীতিবিদসহ জাতীয় পর্যায়ে নীতিনির্ধারকদের সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

৩. **বিনোদন :** শরীর চর্চার লক্ষে প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রশস্ত খেলার মাঠ থাকা প্রয়োজন। সেখানে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, সীরাত মাহফিল, বিজ্ঞানমেলা, বিতর্ক উৎসব, বইপাঠ, দেয়ালিকা প্রকাশ ইত্যাদি অনুষ্ঠাদি নিয়মিত হওয়া উচিত। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সরকারি উদ্যোগে অধিক পরিমাণে শিশুপার্ক গড়ে তুলতে হবে। জাতীয় দৈনিক পত্র-পত্রিকায় পৃথক কিশোরপাতা প্রকাশ এবং প্রিন্টমিডিয়ায় নিয়মিত শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান প্রচার করা যেতে পারে। এ ছাড়া জাতীয়ভাবে একটি দিনকে জাতীয় কিশোর দিবস ঘোষণা করা যেতে পারে।

৪. **আদর্শবান শিক্ষক নিয়োগ :** শিক্ষক সমাজ জাতির বিবেক। তারা শিক্ষার্থীর সামর্থ্য ও চাহিদার নিরিখে শিক্ষাকার্যক্রম পরিচালনা করেন এবং অধিত বিষয়সমূহের মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞানের পরিমাপ করেন। কাজেই শিক্ষক নিয়োগের সময় জ্ঞানের গভীরতা, প্রশিক্ষণ ও আচার-আচরণের বিষয়টি সক্রিয় বিবেচনায় আনতে হবে।

৫. **মূল্যবোধ ধারণ করা :** মূল্যবোধ ধারণ করার কাজ শুরু করতে হবে পরিবার থেকে। আর শিক্ষক তার আচার-আচরণ দ্বারা শিক্ষার্থীর মনে তা গভীরভাবে গেঁথে দিবেন। কাজেই এ কাজের জন্য পরিবার ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে যৌথ ভূমিকা পালন করতে হবে।

৬. **সময়দান :** পিতামাতা যত ব্যস্তই থাকুন ঘরে তাদের সময় দিতে হবে এবং ছেলে-মেয়ের কথা গুরুত্বের সঙ্গে শোনতে হবে। তাদের সঙ্গে এমন আচরণ করতে হবে যেন তারা বড়দের সহানুভূতি পায়। কথায় কথায় তাদের সঙ্গে ঝগড় াকরা যাবে না।

৭. **কাউন্সিলিং :** বর্তমান সময়ে অধিকাংশ পিতামাতা বিশেষত তাদের টিনএজ সন্তানদের নিয়ে ভীষণ দুশ্চিন্তায় দিন কাটান। এ সংকট কাটিয়ে ওঠার লক্ষে তারা মনোচিকিৎসকদের দ্বারা পরিচালিত কাউন্সিলিং সার্ভিসে কিশোরদের অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করতে পারেন।

৮. **আলাদা কারাগার :** শিশু-কিশোর অপরাদীদের কারাগারে বয়স্ক বন্দীদের সঙ্গে না রেখে সম্পূর্ণ আলাদাভাবে রাখতে হবে (Fersousi 2010, 95)।

৯. **অধিক কিশোর সংশোধনাগার প্রতিষ্ঠা :** দেশের প্রতি জেলা শহরে কিশোর সংশোধনাগার প্রতিষ্ঠা করতে হবে (Fersousi 2010, 109)।

১০. **কিশোর আইন রিফর্ম সেল গঠন :** বয়সের নিরিখে কিশোরদের একটি একক আইনানুগ সংজ্ঞা নির্ধারণ করা একান্ত প্রয়োজন। কিশোরদের জন্য প্রণীত আইনগুলোকে অধিকতর কার্যকর করে তোলার লক্ষে বিচারপতি, আইনজীবী, শিক্ষক, মনোবিজ্ঞানী, পুলিশপ্রশাসন ও কিশোর-কিশোরীদের নিয়ে কাজ করেন এমন সব প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে ল' কমিশনের আওতায় ও আইন মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় একটি কিশোর আইন রিফর্ম সেল গঠন করা যেতে পরে।

১১. **আদর্শবান অভিভাবকবৃন্দ :** সমাজের সর্বস্তরের অভিভাবক ও বয়োজ্যেষ্ঠদেরকে সর্বক্ষেত্রে কিশোর-কিশোরীদের সামনে নিজেদেরকে আদর্শ হিসেবে উপস্থাপন করতে হবে। এ লক্ষে তাদের কথা ও কাজে পূর্ণ মিল থাকতে হবে।

১২. **হতাশ হতে না দেওয়া :** কিশোর-কিশোরীরা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ভাবতে থাকে। এর ফাঁকে তাদের মাঝে নিরাশা বাসা বাঁধে। এ সময় তাদের সাহস জোগাতে হবে যেন তারা হতাশায় না ভোগে। মনে রাখতে হবে, নিরাশ হওয়া ঈমানের পরিপন্থী কাজ। মহান আল্লাহ বলেন,

لاَ تَقْنَطُواْ مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهِ-

তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে নিরাশ হয়ো না। (Al-Qurān, 39:53)

১৩. **সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ :** কিশোর অপরাধ প্রতিরোধে মাতাপিতা, পরিবারের অন্যান্য সদস্য, অভিভাবক, শিক্ষক, সরকার, সমাজকর্মী এককথায় সবাইকে সমন্বিত উদ্যোগ নিতে হবে এবং সবাইকে কিশোর অপরাধ প্রতিরোধে সহানুভূতিশীল হতে হবে।

১৪. **পুনর্বাসন :** কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র থেকে মুক্তি লাভের পর তাদেরকে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে। (Fersousi 2010, 109)

১৫. রিয্ক হালাল হওয়া : ইবাদত কবুলের পূর্বশর্ত হালাল রিয্ক। কখনো কখনো লক্ষ করা যায়, অনেক সম্ভ্রান্ত বংশ ও দীনী পরিবারেও নেক সন্তান জন্মগ্রহণ করে না। এর কারণ হিসেবে মুসলিম পণ্ডিতগণ উপার্জনে হালাল-হারাম যাচাই না করাকে দায়ী করেন। কাজেই পিতামাতা ও অভিভাবকবৃন্দকে উপার্জনের ক্ষেত্রে হালাল গ্রহণ ও হারাম বর্জনের বিষয়টি বিশেষভাবে নজর দিতে হবে।

১৬. সন্তানের জন্য দুআ করা : সন্তান-সন্ততি মহান আল্লাহর অসংখ্য নিয়ামতের অন্যতম। কখনো কখনো সন্তান পিতামার সঙ্গে অসদাচরণ করে। এর ফলে তারা মনে ভীষণভাবে কষ্ট পান এবং তাদের বদ দু'আ করেন। কিন্তু পিতামাতাকে মনে রাখতে হবে, পিতামাতার বদ দু'আ তাদের ইহ-পরকাল-উভয় জগত ধ্বংসের কারণ হতে পারে। বরং তাদের বদ দু'আ না করে আল্লাহর কাছে দু'আ করতে হবে। মহান আল্লাহ আমাদের দু'আ করতে বলেছেন এ ভাষায়,

وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَٱجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَاماً-

তারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জন্য এমন স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি দান করো, যারা হবে আমাদের জন্য নয়নপ্রীতিকর এবং আমাদেরকে মুত্তাকীদের জন্য অনুসরণযোগ্য বানাও। (Al-Qurān, 27:74)

উপসংহার

মহান আল্লাহ দ্বিবিধ বৈশিষ্ট্য দিয়ে মানুষকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। ফলে তারা কখনো ভালো কাজ করে আবার কখনো অপরাধে জড়িয়ে পড়ে। বর্তমান সময়ে বিশেষত কিশোর সমাজ ব্যাপকভাবে অপরাধে জড়িয়ে পড়েছে। অপরাধ থেকে ফিরিয়ে এনে তাদের সুকুমারবৃত্তিগুলো বিকশিত করার জন্য বিভিন্ন সময়ে সমাজবিজ্ঞানী, মনোবিজ্ঞানী ও সমাজচিন্তকগণ তাঁদের অভিমত দিয়েছেন এবং আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পর্যায়ে বহু আইন ও নীতি পাশ হয়েছে। বাংলাদেশ সরকার শিশু-কিশোরদের উন্নয়নের লক্ষে জাতীয় শিশুনীতি ২০১১ ঘোষণা করে এবং তাদের উন্নয়নে কতিপয় সুপারিশ প্রদান করে। এসব উদ্যোগ কিছু ফল বয়ে আনলেও আশানুরূপ ফল অর্জিত হয়নি। এমতাবস্থায় আমাদের ফিরে আসতে হবে ঐ মহান জীবনব্যবস্থার দিকে, যে জীবনব্যবস্থা দ্বারা বিশ্বের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব মহানবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ অনৈতিকতার অতল গহীন থেকে তদানীন্তন কিশোর ও যুব সমাজকে তুলে এনে সোনার মানুষে পরিণত করেছিলেন। আর সেই মহান আদর্শ হচ্ছে মহান আল্লাহর মনোনীত একমাত্র নির্ভুল ও পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা ইসলাম। সুতরাং আমাদের বিশ্বাস, বর্তমান বিশ্বে অপরাধের অতল গহবরে নিমজ্জিত কিশোর সমাজকে ইসলামী আদর্শ সত্যিকারভাবে অনুসরণ ও উপরে প্রদত্ত সুপারিশমালা কার্যকর করার মাধ্যমে অপরাধমুক্ত করা সম্ভব হবে।

Bibliography

Al-Qurān al-Karīm

Ahmed, Md. Payar & others. 2010. *New Classical Oxford Advanced Learner's Dictionary (English To Bengali and English)*. Dhaka: Anwara Library.

Al-Bukhārī, Abū 'Abdullah Muhammd ibn Ismā'īl. 1987. *Al-Jāmi' al-Musnad al-Sahīh*. Cairo: Dār Ibn Kathīr.

'Alī Ibn Abī Tālib. 2000. *Nahj al-Balāghah*. Dhaka: Ramon Publications.

Al-Jazā'irī, Abū Bakr Jābir ibn Musā ibn 'Abd al-Qadir ibn Jāber. 2003. *Aisar al-Tafāsīr*. Beirut: Dār al-Sarf.

Al-Māwardī, Abū al-Hasan 'Alī ibn Muhammad ibn Habīb. 1973. *Al-Ahkām al-Sultāniyya wa al-Wilāyāt al-Dīniyya*. Cairo: Mustafā al-Bābi al-Halabī.

Al-Nasafī, Abū al-Barakāt. 2011. Kanz al-Daqā'iq wa Majma' al-Ḥaqā'iq. Beirut: Dār al-Bashāir al-Islāmiyah.

Al-Shāfiʿī, Abū ʿAbdullāh Muḥammad ibn Idrīs. 1990. *Kitāb al-Umm*. Beirut: Dār al-Maʿrifah.

Al-Taftāzānī, Sa'd al-Din. 1982. Sharh al-'Aqā'id al-Nasafī. Egypt: Dār Ihyā al-Turāth al-Arabī.

Al-Tirmīdhī, Abū 'Īsā Muḥammad ibn 'Īsā as-Sulamī aḍ-Ḍarīr al-Būghī al-Tirmidhī. 1998. *Sunan*. Bairut: Dār al-Garb al-Islāmiyyah.

'Awdah, 'Abd al-Qādir. 2003. *Tashrī' al-Jina'i al-Islamī*. Cairo: Maktaba Dār al-Turāth.

Bhuiya, Shahidul Islam. 2009. *Babgladeshe Kishor Oporadh : Karon o Protikar (Seminar Probondho Shonkolon)*. Dhaka: Islamic Center.

Cowie, A. P. (Tony). 1989. *Oxford Advanced Learner's Dictionary of current English*. England: Oxford University Press.

Fersousi, Nahid. 2010. *Shishu o Kishor Bichabebostha Sonshodhon : Bangladesh Prekhapot*. Islami Ain o Bichar. Issue: July-September 2010.

Ghoshal, Dr. Panchanon. 1999. *OPoradh Totto*. Calcutta: Bak-Shahitto Private Ltd.

Ibn Abī Shaybah, Abū Bakr 'Abdullaah ibn Muhammad. 1409H. *Musannaf*. Riyadh: Maktaba al-Rushd.

Ibn Manẓūr, Muḥammad ibn Mukarram ibn Alī ibn Aḥmad ibn Manzūr al-Ansārī. 1998. *Lisān al-ʿArab*. Beirut: Dār al-ʿIlm.

Ibn Qudāmah al-Maqdīsī, Muwaffaq al-Dīn Abū Muḥammad ‘Abdullāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad. 1968. *Al-Mughnī*. Cairo Maktaba al-Qahirah

Islam, Dr. Syed Manjurul. 1997. *Bangladesher Shishu o Tader Odhikar*. Dhaka: UNICEF Bangladesh.

Jatyo Shishu Niti. Govt. of People’s Republic of Bangladesh. 2011.

Muslim, Abū al-Ḥusaīn Muslim ibn Ḥajjāj. 2003. *Al-Musnad al-Sahīh*. Beirut: Dār al-Fikr.

Mustafā, Ibrahīm & Others. 1972. *Al-Mu'jam al-Wasīṭ*. Cairo: Maktaba Dār al-Turāth.

Qadri, Anwar Ahmed. 1986. *Islamic Jurisprudence In The Modern World*. New Delhi: Taj Company.

Raheem. Dr. Shah Muhammad Abdur. 2012. *Islame Sonatan Lalon-Palon*. Dhaka: Sonali Sopan.

Sadek, Dr. Mohammad. 1989. *Oporadh o Sonshodhon.* Rajshahi: Somobay Biponi Kendro, Rajshani University Chottor.

Salam, Mohammad Abdus. 1989. *Oporadh, Shasti, Sonshodhonmulok Probation ebong Muktiprapto Koyedir Sonshodhonmulok Karjokrom*. Dhaka: Aligarh Library.

Shishu Ain. Govt. of People’s Republic of Bangladesh. 2013.

Shishu Bishyakosh. Editorial Boards. 1997. Bangladesh Shishu Academy.

Tabbārah, 'Afif 'Abd al-Fattāh. 1983. Al-khātāya fī Nazr al-Islām. Egypt: Dār al-Ilm al-Malayīn.

Tappan, W Paul. 1949. Juvenile Delinquency. New York : McGraw-Hill Book Co.

'Ulwān, 'Abdullah Nāseh. 1981. Tarbiyah al-Awlād fī al-Islām. Beirut: Dār al-Salām.

UNICEF. 1992. Convention on the Rights of the Child (CRC) (জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ). Dhaka: UNICEF Bangladesh.

Newspaper

Daily Prothom Alo, 13 January 2021. https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/এত-কম-বয়সী-শিশুরাও-হত্যায়-জড়িত

BBC Bangla, 13 January 2021. https://www.bbc.com/bengali/news-55650710

Daily Samakal, 16 Septembar, 2017. https://samakal.com/bangladesh/article/1709893/ এক-বছরে-মামলা-বেড়েছে-৩৪

Daily Inqilab, 6 December, 2017. https://www.dailyinqilab.com/article/107234 /মাদকাসক্ত-লাখ-লাখ-শিশু-কিশোর